বাগেরহাটে স্কুল থেকে ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে

বাবুল সরদার, বাগেরহাট ॥ বাগেরহাটের বেমরতার চিতলী বৈটপুর গ্রামের দশ বছর বয়সী আবুল হাসান গত এক বছরে ধরে আর স্কুলে যায় না। এখন তার লেখাপড়া বন্ধ। সে পিতার সঙ্গে ক্ষেতমজুরের কাজ করে। তার পিতার নাম শেখ আব্দুর রশিদ। মা হাজেরা বেগম। হাসানরা তিন ভাইবোন। তার বড় বোন রাখির অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ভাই হাসেনের বয়স সাড়ে-সাত। সে চিতলী সরকারী রেজিস্ট্রার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণীতে পড়ে।

জানা গেছে, জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় ৪ জনের সংসার চালাতে অপরাগতার কারণে আব্দুর রশিদ শেষ পর্যন্ত হাসানের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। আব্দুর রশিদের ভাষায়, লেখাপড়া করানোর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পেট চালাইতে পারি না। তাই লগে লইয়া কাজে নামছি। একই এলাকার হানিফ হাওলাদারের ছোট মেয়ে ৮ বছরের খাদিজা ক্লাস ওয়ানে পড়লেও বড় মেয়ে ১৪ বছর বয়সী সালমা আক্তার এক বছরেরও বেশি স্কুলে যায় না। সে ফতেপুর কে.বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। রিক্সাচালক হানিফ হাওলাদারের ভাষায়, 'জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক, পেট চলে না। উপবৃত্তি মাত্র ২৫ টাকা করে দেয়। কি খাবো, আর কি দিয়ে মেয়ের বই কিনে দেব। তাই বাধ্য হইয়া পড়া বন্ধ করে দিতে হইছে।'

ফতেপুর গ্রামের ক্ষুদ্র হোটেল ব্যবসায়ী আলম শিকদার ব্যবসায় মন্দার কারণে দেনাগ্রস্ত হয়ে সংসার চালাতে না পেরে অবশেষে মেয়ে রেশমী আক্তারের লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। ১৫ বছরের রেশমীর দেড় বছর ধরে আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। সে ফতেপুর স্কুলে ৯ম শ্রেণীতে পড়ত। ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র ১১ বছরের শামীমের পড়াশুনা এখন বন্ধ। ৮ বছরের সজীবকে তার পিতামাতা আজও স্কুলে পাঠায়নি। শামীম ও সজিবের মা শিরিনা বেগমের ভাষায়, 'আমাগোমতন গরিব মানুষ তো আর ছেলেমেয়েদের বেশিদূর লেখাপড়া করাতি পারবো না; পেট তো চালাতি হবে, তাই দুই/এক ক্লেস (ক্লাস) পড়ে লাভ কি।' তাঁর চেয়ে ছোট বেলায় কাজ শেহা (শেখা) ভাল।' বৈটপুর গ্রামের কাঠমিস্ত্রী মোস্তফা খানের ছেলে ১০ বছরের নামজুল এখন শিশুশ্রমিক। সে চিতলী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। দারিদ্র্যের কারণে এ গ্রামের ক্ষেতমজুর আজাহার শেখের ছেলে ২য় শ্রেণীর ছাত্র ৯ বছরের হাসানেরও অনুরূপ লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এ জরিপে জানা গেছে, গত দু'বছরে কেবল মাত্র বেমরতা ইউনিয়নে প্রায় এক শত ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। বাগেরহাট জেলাব্যাপী প্রায় সর্বত্র একই চিত্র বলে একাধিক সূত্রে মত প্রকাশ করেছে। এ জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে প্রতি বছর স্কুল থেকে ১৫ ভাগের বেশি ছাত্রছাত্রী ঝড়ে পড়ছে। তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রাণ গোবিনন্দ নন্দীর মতে, ঝড়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭/৮ ভাগের বেশি হবে না। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা খাজিদা বেগম জানান, কেবল পারিবারিক দারিদ্র্যতাই নয় অভিভাবকের অসচেতনতার কারণেও স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীর ঝড়ে পড়ার সংখ্যা রোধ করা যাচ্ছে না। বেমরতা ইউপি চেয়ারম্যান এমদাদুল হক সাবেক চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মিনা ও মনোয়ার হোসেন টুপরসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণীপেশার প্রতিনিধিদের মতে, সরকার ও বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে আরও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচারণার পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের অব্যাহত লেখাপাড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত সুদূরপ্রসারী কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে স্থানীয় গ্রামীণ এ্যাডভোকেসি কেন্দ্রীয় সভাপতি মোস্তফা মিনা সদস্য অলিউর রহমান পল্টু মনে করেন, উল্লেখিত উদ্যোগের পাশাপাশি অতিদরিদ্র পরিবারের স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ উপবৃত্তি চালু ও শিক্ষা সরঞ্জাম (বই-খাতা-কলম) সরবরাহ করা গেলে স্কুল ত্যাগী বা ঝড়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রাণ গোবিন্দ নন্দী জানান, জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬০২টি বেসরকারী ৪৮৮টি এবং কমিউনিটি স্কুল ২৮টি রয়েছে। প্রাইমারী পর্যায়ে (৬ থেকে ১০ বছর) এ জেলায় মো ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক লাখ ৯৫ হাজার ৯শ'। তাঁ মতে, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ৭ শতাংশে বেশি হবে না। এরা স্থান পরিবর্তন, পারিবারি অসচ্ছলতা, অভিভাবকের অসচেতনাসহ বিভি টানাপোড়েনের কারণে ঝড়ে পড়ে। এটা স্বাভাবিক বে তিনি মনে করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

26 DEC 2006